শ্রীরামকৃষ্ণ ও অদ্বৈতভাবনা

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

অদ্বৈততত্ত্বকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টাকে অদ্বৈতভাবনা বলা যেতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে যোগ করলে বিষয়টি দুরূহ হয়ে পড়ে। কারণ সর্বভাবাশ্রয়ী শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতভাবনা কোন স্তরে ছিল তা যথাযথ বোঝা আমাদের বোধবুদ্ধির বাইরে।

স্বাভাবিকভাবেই মনে উঠবে যে, তাহলে এই প্রসঙ্গের অবতারণা কেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই এর উত্তর দিয়ে রেখেছেন। সেই অদ্বৈতসত্তার সগুণ রূপ তিনি। তাঁর স্বীকারোক্তি : ''দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার!... দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।'' সেই অনন্ত আনন্দসত্তার প্রেমপীযূষস্রাবী 'গাভীর বাঁট' তিনি। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গাকে নয়—যেকোনও জায়গায় স্পর্শ করলে সেই গঙ্গাকেই স্পর্শ করা হয় ও তার পাবনী শক্তিকে অনুভব করা যায়। এগুলি যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর কথার সূত্র ধরে আমাদের সাধারণ বোধবুদ্ধিতে সেই ভাবনার একটু আভাস পাওয়ার চেষ্টা করতে অসুবিধে কোথায়? তাঁরই কথার রেশ ধরে বলি, ''অনন্তকে জানার দরকারই বা কি?'' ''যদি... আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার?''

বেদান্ত বলতে আমরা সাধারণত অদ্বৈতকে লক্ষ করে থাকি। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বোঝাতেন। অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞানচর্চার লক্ষ্য, নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা নিরন্তর বর্জনের পালা সেখানে—নেতি, নেতি। বেদান্তীরা বলেন, এ-পথে ঈশ্বরে বিশ্বাস বা তাঁকে মানার দরকার নেই। শুধু যুক্তিবোধ ও বিশ্লেষণী শক্তি থাকলেই হল। কারণ এখানে অলৌকিক কিছু পাওয়ার বা দর্শনের ব্যাপার নেই, যা ভক্তিযোগের পথে বা রাজযোগের পথে থাকে। এর প্রস্তুতির জন্য কোনও কল্পনাকে আশ্রয় করে তার অনুসরণেরও প্রয়োজন নেই। আমাদের নিত্য অনুভব জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ধরেই বিচার শুরু হতে পারে। আবার এখানে বিচারের শেষে যা পাওয়ার তা একেবারে এবং তখনই। কারণ এর উদ্দেশ্য আমাদের চোখের সামনে যে-বহুর প্রকাশ—যা আমাদের দেহমনবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে আমাদের স্বরূপকে ঢেকে রেখেছে—সেই অজ্ঞানতার নিবৃত্তি। এর নিবৃত্তি হলেই জ্ঞানের উদয়; ঠাকুরের ভাষায় : ''হাজার বছরের অন্ধকার ঘর—আলো নিয়ে গেলে

একক্ষণে আলো হয়ে যায়!—একটু একটু করে হয় না।" বহুজ্ঞান অজ্ঞান, একের জ্ঞানই জ্ঞান। জ্ঞান বলা ঠিক হয় না, কারণ তাকে জ্ঞানের বিষয় করা যায় না। সাধকই জ্ঞানস্বরূপ হয়ে ওঠেন। বহুর জ্ঞান বা ভেদজ্ঞানের বিভ্রম থেকে এক-এ স্থিতি। বহুত্বের বিভ্রম থেকে মুক্ত হয়ে নিজের স্বরূপে স্থিতিলাভ। সেই নির্গুণ, নির্বিশেষ, চিরন্তন তত্ত্বই আমাদের স্বরূপ। এই স্থিতিলাভের পথে বিচারের ধারাটি কেমন তা একবার আমাদের মতো করে দেখব, যদিও নানাভাবে এই বিচারের ধারাটি চলে আসছে।

এই জগৎ যে অনিত্য তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কোনও কিছুই স্থির নয়, জলধারার মতো নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই পরিবর্তন আমরা বুঝি কী করে? পরিবর্তন বস্তুটি আপেক্ষিক, কারণ কোনও একটি অচল বস্তু না থাকলে সচলতার অনুভব হবে কী করে! যুক্তি হতে পারে—কেন? অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনের সাপেক্ষে বোঝা সম্ভব। কিন্তু তাহলে সেই কম পরিবর্তনশীলতা বুঝতে গেলে আর-একটি আরও কম পরিবর্তনের বস্তুর দরকার পড়বে, এবং সেটি বুঝতে আর-একটি। এভাবে এক অনবস্থার সৃষ্টি হবে এবং আমাদের একটি অচল বস্তুর সত্তাকে ধরে নিতেই হবে। এখন সেই বস্তুটি কী হতে পারে তা আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

আমরা যে আছি—এটি কিছু পড়ে বা শুনে জানতে হয় না। আমাদের অস্তিত্ববোধ আমাদের অনুভবের গভীরে। তাই আমরা বাইরে যা কিছু দেখি—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের মাধ্যমে এই যে জগতটার অস্তিত্বকে অনুভব করি, সেই অস্তিত্বটি কী—এ-প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। প্রত্যেক বস্তু বা জীবের একটি অস্তিত্ব আছে যা তার নিজস্ব। তাহলে কি এই জগৎ অসংখ্য খণ্ড খণ্ড অস্তিত্বের সমষ্টি? অস্তিত্ব মানেই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারও ওপর নির্ভর করলে তাকে আর তার নিজস্ব অস্তিত্ব বলা চলে না। কিন্তু আমরা দেখি এই খণ্ড অস্তিত্বগুলি প্রায়শ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। মানুষের ক্ষেত্রে একের অস্তিত্বের সংকট অপরকে প্রভাবিত করে। একজনের দুঃখ বা সুখ অপরের দুঃখ বা সুখের কারণ হয়। একজনের অস্তিত্বের প্রকাশ অপরের প্রকাশকে প্রভাবিত করে। তাহলে কি একটিই অস্তিত্ব অসংখ্য রূপে প্রকাশ পাচ্ছে? আর সেই প্রকাশেরই তারতম্যে জগতে চেতন ও অচেতন বস্তুর অনুভব হচ্ছে? এরকম বহু প্রশ্ন আমাদের মনে উঠতে থাকে। শাস্ত্র বলেন এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে নিজের মধ্যে ডুব দিতে হবে, কারণ জগতের অনুভব বাইরে কোথাও নেই, তা আমাদের অন্তরেই বর্তমান। অতএব, নিজের অস্তিত্বের স্বরূপকে খুঁজে পেলে এই সামগ্রিক অস্তিত্বকে জানা যাবে।

এই অস্তিত্ববোধ খোঁজার শুরুতেই আমাদের অস্তিত্ব দেখি আমাদের শরীর ঘিরে, অর্থাৎ এই শরীরটাই আমি। এই শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গে আমারও বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত মন মেনে নেয় না, মনে হয় মৃত্যু হলেও আমি থাকব, যদিও কীভাবে তা আমরা জানি না। আর এই বোধ থেকেই জন্ম নিয়েছে ভূত-প্রেত, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির কল্পনা। এই কল্পনায় অবিশ্বাস অজ্ঞেয়বাদের জন্ম দেয়, যদিও যথার্থ অজ্ঞেয়বাদীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। কারণ, মানি বা না মানি মানুষমাত্রেরই মনে এ-বিষয়ে গভীর বিশ্বাস, আর তাই জগতের সব ধর্মই কোনও না কোনওভাবে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে মান্যতা দেয়। বস্তুত এই বোধ থেকেই সমস্ত ধর্মের উৎপত্তি। তাহলে আমাদের অস্তিত্ব কি সত্যই স্থির? বিচার করলে দেখি, আমার অস্তিত্বের আমি তো সেই শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত একই রয়েছে, আর শরীরটা ক্রমান্বয়ে বদলে গেছে। তাহলে এই শরীরটা আমার অস্তিত্ব হতে পারে না। তাহলে কি প্রাণশক্তি যা এই শরীরটাকে চালাচ্ছে

সেটিই আমার অস্তিত্ব? কিন্তু সেটিরও তো পরিবর্তন ঘটছে। যে-প্রাণশক্তি আগে ছিল তার তো নিত্য ক্ষয় হচ্ছে। একইভাবে মনকেও আমার অস্তিত্ব বলে ভাবতে পারছি না, কারণ তার তো নিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। বুদ্ধি—যা আমাদের এই জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে সেটিও পরিবর্তনশীল, তাই সেটিকেও আমার অস্তিত্ব বলে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে না। আসলে যা কিছু আমি জ্ঞানের বিষয় করি সেটি আমার থেকে আলাদা হতেই হবে। একজন জ্ঞাতা থাকবে আর একটি জ্ঞানের বিষয় থাকবে, তবেই জ্ঞান হবে। সে-কারণেই আমি দেহ এ-বোধ আমাদের থাকলেও বলবার সময় আমরা আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এইভাবে বলে থাকি। অর্থাৎ আমরা জ্ঞাতা হিসাবে এগুলির অনুভব করি। এখন এই জ্ঞাতাটি কে? অতএব প্রয়োজন নেতি নেতি বিচারের, যার শুরুতে প্রথমে আমি দেহ নই, তারপরে আমি দেহাভ্যন্তরের প্রাণশক্তি নই, আমি মনও নই আবার বুদ্ধিও নই। নির্বাণষটকম্-এ বলা হচ্ছে ''ওঁ মনোবুদ্ধ্যহংকার-চিত্তানি নাহং/ ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।/ ন চ ব্যোমভূমির্ন তেজো ন বায়ু-/ শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্।'' মন আর বুদ্ধিই শুধু নয়; মনের সৃষ্টি অহংকার, যা আমাদের উৎকর্ষ ঘোষণা করতে সদা ব্যাকুল, সেটির তো কোনও স্থিরতাই নেই। চিত্ত যা আমাদের অনুভবের ভাণ্ডার, ইন্দ্রিয় দিয়ে আসা অনুভব যে-চিত্ত থেকে পুরনো নথির সঙ্গে মিলিয়ে বুদ্ধি তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সেটি কী—কার কণ্ঠস্বর, গন্ধ, রূপ বা স্পর্শ ইত্যাদি, সেই চিত্তের নথিও মুছে যায়, এমনকী চিরকালের মতোও। বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি তো নয়ই, কারণ সেগুলির ক্ষয় হচ্ছেই। আবার আমাদের শরীর যা পঞ্চভূতের সৃষ্টি সেই পঞ্চভূতও পরিবর্তনশীল, তাই এগুলি বিচারে সব বাদ চলে যায়। এখন এই সবগুলি বাদ দিলে কী থাকবে? অবশ্যই এক শূন্যতা। কিন্তু সেই শূন্যতারও তো অনুভব হবে, অর্থাৎ সেটি জ্ঞানের বিষয় হবে, সুষুপ্তিতে যেমন হয়। সেখানে বাহ্য ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে পড়ে, আর মনও তার অনুচরদের নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। তথাপি জেগে উঠে আমরা সেই শূন্যতার এক শান্তিময় আনন্দ উপভোগ করি, বলি দারুণ ঘুমিয়েছি। তাই সেই জ্ঞাতারূপ অস্তিত্বের আমিটি তারও পারে এক পূর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে। সেটি কী তা বলার কেউ থাকে না, 'অবাঙ্মনসোগোচরম্'—''বোঝে প্রাণ বোঝে যার।''

যুক্তি দিয়ে সেই সত্তাটির একটি আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও সেই উপাধিবিহীন সত্তাতে স্থিতিলাভ তো করা গেল না। এর কারণ, যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্তের জ্ঞান অনুভূত অজ্ঞানকে দূর করতে পারে না। চাই সেটিকে অনুভবে আনা। বেদান্তবাদীরা বলেন এর জন্য চাই 'শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন'। বারবার শুনতে হবে এই অকাট্য সত্যটিকে, যতক্ষণ না এটি মনের মধ্যে আলোড়ন তোলে। এই আলোড়নটি জিইয়ে রাখাই মনন। তারপর ওই মননশীলতাকে সেই অস্তিবিন্দুতে নিবিষ্ট করাই নিদিধ্যাসন। এই জগৎ ও দেহভাবকে অতিক্রম করা মুশকিল। তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে নিদিধ্যাসনে বসিয়েছেন, কিন্তু এই দেহ, মন, এই জগদ্‌ভাবকে অতিক্রম করলেই ঈশ্বরের মাতৃরূপ তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে ঠাকুরকে আর এগোতে দিচ্ছেন না। তখন তোতাপুরী একটা ভাঙা কাচের টুকরো দুই ভুরুর মাঝখানে বিঁধিয়ে দিলেন, ওই যন্ত্রণায় মনোনিবেশ করতে বললেন। এবার মা সামনে এলে ঠাকুর তাঁকে মনে মনে খড়্গ দিয়ে দুখানা করে ফেললেন। মনের আর কোনও আশ্রয় রইল না, সেই নিরুপাধিক সত্তায় মিশে গেল। প্রথম দর্শনের শক্তিরূপ জ্যোতিঃসমুদ্রের ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া সেই উত্তাল তরঙ্গ এখন শান্ত, নিরুপাধিক অসীম সত্তার গভীরে বিলীন হয়ে গেল।

ঠাকুরের অনুভবে এল এই বিশেষ তত্ত্বটি—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

সে বড় কঠিন সময়। অসংখ্য অর্থহীন আচার-আচরণই ধর্ম বলে স্বীকৃত। এর ওপর ভিত্তি করে সমাজ অসংখ্য সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকে নিজেরটিকে সত্য বলে মেনে অপরেরটিকে উপহাস করে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী মানুষ এর মধ্যে কোনও সারবত্তা খুঁজে পায় না। রামমোহন রায় উপনিষদ থেকে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা শুরু করলেন। বেদান্তের যুক্তি শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করল। শুরু হল নিরাকার সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার এক নতুন সম্প্রদায়—ব্রাহ্মসমাজ। এছাড়াও শুদ্ধ অদ্বৈতবাদীর নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মের সাধনায় কিছু মানুষ আকৃষ্ট হলেন। এই দুই দলই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন। ব্রহ্মবাদীরা বিচারে জগৎ স্বপ্নবৎ বলতেন, আবার গুছিয়ে সংসারও করতেন। মহিমা চক্রবর্তী জগৎ স্বপ্নবৎ বলেন, অবতার মানেন না। ঠাকুর তাঁকে বলছেন চোখ বুজে, ''চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই তিনি নাই! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।... আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি আর নাই? আমি নিত্য লীলা দুইই লই... সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না।'' শুনে মহিমা বললেন, ''সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কই?'' ঠাকুর প্রত্যুত্তরে বলেন, ''কেন তুমি তো বল সব স্বপ্নবৎ।'' জগতকে স্বপ্নবৎ বলা আবার সেই জগতকে নিজের ক্ষুদ্র ভোগসুখে লাগানো যে নিজেকে প্রবঞ্চনা করা সেটি মনে হয় না। তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক এই দুই ভাগে ভাগ করে তার আড়ালে নিজ কর্মের সমর্থন খোঁজা চলে। তাই ঠাকুর বলছেন, ''সংসারীর পক্ষে সেব্য-সেবকভাব খুব ভাল। সব করা যাচ্ছে, সে-অবস্থায় 'আমিই সেই' এ-ভাব কেমন করে আসে। যে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ, তার নিজের দেহ-মনও স্বপ্নবৎ, তার আমিটা পর্যন্ত স্বপ্নবৎ, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেবকভাব, দাসভাব খুব ভাল।''

শুধু সংসারীর পক্ষেই নয়, সন্ন্যাসীর পক্ষেও নিরন্তর বিচারে থাকা খুব কঠিন। পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেন। যখন তিনি উত্তরকাশীতে তপস্যারত তখন কাছাকাছি এক কুঠিয়ায় দুজন সাধু তপস্যা করছিলেন। একদিন দেখেন যে তাঁদের মধ্যে একজন তল্পিতল্পা নিয়ে চলে যাচ্ছেন। মহারাজ তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, সঙ্গী সাধুটির কলেরা হয়েছে তাই তাঁর ধ্যানে বিক্ষেপ হচ্ছে বলে তিনি চলে যাচ্ছেন। যে-ব্রহ্মস্বরূপের সন্ধানে তিনি অন্তরে ডুব দিয়েছেন সেই সত্তা যে সঙ্গীর অন্তরেও বর্তমান তা মনে করে তাঁকে সাহায্য করার কথা মনে আসছে না। তিনি 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা' টুকু নিয়েছেন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরবর্তী অংশ 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' পরিত্যাগ করেছেন। আরও একটি ঘটনার কথা মহারাজ বলতেন। উত্তরকাশীতে ছত্রে ভিক্ষার সারিতে সেদিন কর্মচারীটি ঘোষণা করলেন যে পরদিন গ্রহণ, তাই গ্রহণমুক্তির পর ভিক্ষা মিলবে। একজন বড় চেহারার উদাসী সাধু শুনে বললেন, ''আরে সন্ন্যাসীকে লিয়ে গ্রহণ কেয়া অওর ত্যাগভি কেয়া!'' কর্মচারীটি বিনীতভাবে বললেন, ''ইয়ে তো ব্যাবহারিক বাত হ্যায়।'' তাতে হুংকার দিয়ে সাধুটি বললেন, ''ব্যবহারমে রহনা হ্যায় ইয়া পরমার্থ্ মে রহ্না হ্যায়!'' কর্মচারীটি উত্তর দিলেন না। মহারাজ বলতেন, ''কর্মচারীটি বলেননি যা, সেটি হচ্ছে 'পরমার্থতেই থাকুন না, ঝুলি হাতে এ-ভিক্ষার দুয়ারে এসে দাঁড়ানোর দরকার কী?' এ বেদান্ত ভয়ংকর।''

একটি সাধারণ ধারণা যে, অদ্বৈতভাবই সর্বোচ্চ ও অন্য ভাবগুলি নিম্নতর। অদ্বৈতভাবকে বলা হয় শেষ কথা অর্থাৎ কথা শেষ—সেখানে কথা পৌঁছয়

না। শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু কথার আলোকে আমরা বিষয়টি দেখতে পারি। স্বামীজী সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চাইলে ঠাকুর বলেছিলেন, ''ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই তো গান গাস, 'যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'।'' রাজা মহারাজ বলতেন, ''নির্বিকল্প সমাধির পরই যথার্থ ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।'' তার মানে 'কথা শেষ' থেকে কথার জগতে ফিরে যথার্থ ধর্মের প্রকাশ ঘটে। এগুলি বোঝা দুরূহ, কারণ এগুলি অনুভবসাপেক্ষ। মহিমাচরণ প্রশ্ন করেছেন—''ভক্ত—এর এককালে তো নির্বাণ চাই?'' ঠাকুর উত্তরে বলছেন, ''নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এইরকম আছে যে, নিত্যকৃষ্ণ তাঁর নিত্যভক্ত! চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম!

''যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে। নিত্যকৃষ্ণ, নিত্যভক্ত! তুমিই তো বল গো অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসা ততঃ কিম্।'' জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে বলতেন, ''ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে... তেমনি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকারমূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে আগেকার যেমন জল, তেমনি জল।'' আরও বলতেন, ''এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।... তাঁর ইতি করা যায় না।''

বস্তুত আচার্য শংকরের অদ্বৈতভাব যেন এক নতুন রূপ পেয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভবে। তোতাপুরী যিনি তিনদিনের বেশি কোথাও থাকেন না, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী, তাঁকেও এগারো মাস কাটাতে হল দক্ষিণেশ্বরে শুধু ঠাকুরের ব্রহ্ম-শক্তির অভেদতত্ত্ব অনুভব করতে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী তো পূর্ণ, তাঁর আর নতুন কী জানার থাকতে পারে! আসলে বিশুদ্ধ পূর্ণতা আমাদের ধারণায় আসে না, কিন্তু আধার অনুযায়ী পূর্ণতা বললে খানিক ধারণা হয়। ঠাকুরের কাছে বিভিন্ন সাধনার গুরু যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই পূর্ণতর হয়ে ফিরে গেছেন। ঠাকুর বলতেন, ''যখন গান করতুম ন্যাংটা কাঁদত—বলত, 'আরে কেয়া রে!' দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেঁদে ফেলত!''

যেদিন দেহের রোগের জন্য গঙ্গায় শরীর ছাড়তে গিয়ে ডুবে যাওয়ার পর্যাপ্ত জল পেলেন না, সেদিনকার সে-মুহূর্তটি লীলাপ্রসঙ্গকার তাঁর অনবদ্য লেখনীতে ধরে রেখেছেন। '' 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! একি ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা।... আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা! এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে অবস্থিত—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!''

ঠাকুরের হাতে 'রোটি ঠোকা' সেই মাতৃশক্তির ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না, দেহ ছাড়া তো বহু দূরের কথা। বুঝলেন সেই শক্তিই তাঁকে এতদিন দক্ষিণেশ্বরে আটকে রেখেছিলেন। তোতা পুরুষকারে বিশ্বাসী, শক্তির কৃপা মনের দুর্বলতা মনে করতেন, সে-ভাব দূর হয়ে গেল—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'।

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন যে, ঠাকুর বলতেন ''অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।'' আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি না কেন? কারণ, আমাদের ইচ্ছা দৈহিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নানা বিধিনিষেধে আবদ্ধ। 'যা ইচ্ছে তাই কর' মানে

এইসব বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে যাও, এবং সেটি সম্ভব ব্রহ্ম-শক্তির অভেদতত্ত্বকে আঁচলে বেঁধে অর্থাৎ জ্ঞানের অঙ্গীভূত করে—সেই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ প্রকাশ এই জগতের সর্বত্র ব্রহ্মকে অনুভব করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন (১২।৪),

''সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥''

সর্বত্র সমবুদ্ধি হলে, সর্বত্র তাঁকেই দেখলে, সকলের হিতকর্ম ছাড়া 'যা ইচ্ছে তাই' করা যায় না। স্বামীজী ঠিক এই বেদান্তকেই ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—সমবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানীর লক্ষণ যে সর্বভূতহিতকারিত্ব, সেটিরই আরোপ করে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ওঠা, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব' এই আশ্বাসে জীবনকে 'আত্মনো মোক্ষার্থং' করে তোলা।

স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের স্তোত্রে বলেছেন, 'অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তং'—মনকে অদ্বয়, অদ্বৈততত্ত্বের নোঙরে বেঁধে নিজেকে ভক্তির চাদরে মুড়ে প্রকাশ করছেন। ভক্তি শক্তির এলাকায়; তাঁর দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে অগণন যাওয়া-আসা। ''একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে... শক্তি বলি।'' এই অবস্থাটি ভক্তদের সামনে তাঁর নিত্য ঘটছে। মন অদ্বৈতে লীন হয়ে গেলে ডাক্তার ঠাকুরের চোখে আঙুল দিয়ে প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন না, এমনকী নাড়ির স্পন্দন পাচ্ছেন না। শিব যেন তাঁর ই-কার রূপী প্রকৃতিকে ছেড়ে শব হয়ে শক্তির পদতলে পড়ে আছেন। আবার মন শক্তির এলাকায় ফিরে এলে সত্ত্বগুণের বিদ্যাশক্তি দিয়ে জগতকে আমোদিত করছেন। তাঁর মধ্যেই ব্রহ্ম-শক্তির অভেদত্ব প্রকাশিত। তাঁর এই বিশেষ প্রকাশকে শ্রীশ্রীমা আরও সহজ করে বলে দিলেন। মায়াবতীতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্য পূজা করে যখন তরুণ কর্মীরা স্বামীজীর বিরাগভাজন হয়েছেন তখন তাঁরা তাঁদের সংশয় সঙ্ঘের সর্বোচ্চ অধিকারিণী শ্রীশ্রীমাকে জানালেন। শ্রীমায়ের উত্তর চিরন্তন দিগ্‌দর্শী হয়ে রইল। লিখলেন, ''তোমরা যাহার শিষ্য তিনি তো অদ্বৈত, অতএব আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'' শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদী নন, তিনি অদ্বৈতের মূর্তরূপ। সুতরাং তাঁকে ও তাঁর ভাবকে অনুসরণকারীরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী। ঘরে ঘরে পূজিত তাঁর ছবিটি শ্রীরামকৃষ্ণেরই মতে অতি উচ্চ অবস্থার ছবি। পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী বলতেন, ''তাঁর সমাধিস্থ চোখের দিকে দেখলে তার অতলান্ত গভীরতা আমাদের অবাক করে।'' বস্তুত আমাদের মনে হয় তাঁর চোখ দুটি সেই অনন্ত মাঠের সামনে পাঁচিলের ফাঁক, যার মধ্য দিয়ে সেই অনন্তকে দেখা যায়, সাধনার বলে সে-ফাঁক গলে অনন্তে মিশে যাওয়াও চলে। শিবলোক ও জীবলোকের মধ্যে সেতু ওই চোখদুটি। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১
২। স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ১ ও ২, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০